আবদুল মাননান সৈয়দ : সমালোচনা চিন্তার প্রাতিষ্ঠানিকতায়

মুনিরা সুলতানা*

সারসংক্ষেপ : কবিতা-পাশ-প্রবন্ধ-সমালোচনা-উপন্যাস-নাটক-চিত্রকলাসহ আধুনিক প্রয় সকল সাহিত্য-উদ্যানবেক সৃষ্টির নিদর্শন রেখেছেন আবদুল মাননান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০)। তার সাহিত্যজীবন পঞ্চম বছরে। ছন্দ, সাহিত্যালোক, রূপতত্ত্ব, নদনতত্ত্ব ও প্রাচ-প্রাচীন সাহিত্যতত্ত্ব সবই ছিল তার অধিকাংশ। বিশেষত সাহিত্যের তেলী-শনামকরণ ও বিচার-ব্যাখ্যায় তার প্রকাশভঙ্গি অন্যায়। ক্লাসিক, আধুনিক ও সমকালীন দেশীই ও আন্তর্জাতিক সাহিত্যচর্চায় তিনি নিরস্ত কাজ করেছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে কিংবা সাহিত্য-সমালোচনায় তার বহুচারী ব্যবহার ও একাধি মানস নতুন সৃষ্টির পথে সরসময় ধারিত হয়েছে। সমালোচনা তার কাছে সৃষ্টির পরিপূরক নবনির্মাণ। সমালোচকের প্রমিত দৃষ্টির বিচিত্রি তিনি একাধারে সমালোচনার পরিধি, পদ্ধতি ও রূপকল্পের নানা দিকের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। সেইসাথে সমালোচনাকর্মের মাধ্যমে পদ্ধ ও গদাসাহিত্যের মান নির্ভর ও এক অসামান্য প্রচুর ছিল মাননান সৈয়দের। বর্তমান প্রবর্তনে আবদুল মাননান সৈয়দের সমালোচনা-চিন্তা, মতাদর্শ ও তারা সাহিত্য-মূল্যায়ন ভঙ্গিমা বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে সমালোচনা হলো সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে বুদ্ধির প্রতিক্রিয়ার সম্মিলন। সাহিত্যসৃষ্টির মানস-প্রক্রিয়াকে যারা বিচার করেন, তাদের সম্পর্কে সাহিত্যপ্রক্রিয়ার রয়েছে বিচিত্র ভাবনা। লেফ তলিওর বিশ্বাস, “Critics are the stupid who discuss the wise.” (বিমলকুমার, ২০০৬ : ৯)। প্রচলিত আছে যে গায়টে বিদ্রোপ করে বলেছিলেন যে “kill the dog he is a reviewer.” (বিমলকুমার, ২০০৬ : ৯)। টি. এস. এলিয়ট সমালোচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার Function of Criticism (1923)-এ লেখেন যে সমালোচনা হলো “elucidation of taste”। আবার 'The Frontiers of Criticism' (1956) নামক লেখায় তিনি তার পূর্বেরা বক্তব্যকে কিছুটা সংস্কার করে বলেছেন সমালোচনা হল “to promote the understanding and

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

https://doi.org/10.62328/sp.v55i1.6
বাংলা সাহিত্যে সমালোচনার সূত্রপাত উনিশ শতকের মাঝামাঝি সে-সময় বাংলা সাময়িকপত্রে সাহিত্যবিচার বা মূলত সাহিত্যতত্ত্ব প্রসঙ্গে প্রকাশিত রচনাগুলো বাংলা সমালোচনার সমৃদ্ধিতে গভীর অবদান রেখেছিল। এ পর্যায়ে সমালোচনা ছিল মূলত ইতিহাস-জিজ্ঞাসা এবং কিছুটা পাশ্চাত্যরীতি অনুসারী। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যকে সার্থক করে তোলেন বক্ষঃচন্দ্র চট্টোপাধ্যায। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের প্রত্যেক প্রসঙ্গে প্রকাশিত ‘বঙ্গদর্শন’ (১৮৭২) পত্রিকা সার্থক হয়েছিল বহু সংখ্যক লেখকের জন্য দিয়ে। এই সময় বাঙালি জাতির সাদৃশ্যকার বোধ হয়ে থাকলে জাগ্রত হয়েছে। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বিচিন্তিতায় আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনার গোড়াপত্তন হয়েছে।

বক্ষঃ-সমালোচনা বুদ্ধিদীপ্ত, যুক্তিনিষ্ঠ, সমাধিজ্ঞাত, বীর্যমূল এবং সরসবেদ হয়ে প্রস্তুত হয়। বাংলা ব্যবহারিক সমালোচনায় বক্ষঃচন্দ্র প্রধান পথ প্রদর্শিত এবং একজন সমালোচক। উনিশ শতকের সাহিত্য সমালোচনায় কখনও কখনও নান্দনিক প্রতীতির তুলনায় নেতিক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। এ পর্যায়ে সাহিত্য সমালোচনায় নবজাগ্রত চেতনার উদ্ভাসন ও উপলব্ধির নতুন মাত্রা অনুভব করাতে বীর্যদৃষ্টান্ত।

সমালোচনাকে প্রায় পুরোপুরি শিল্পে পরিণত করে একই সাথে সাহিত্যের স্রোত, তত্ত্ব, উদ্দেশ্য, সৌন্দর্যবোধ প্রকৃতি জিজ্ঞাসাকে সম্পর্কে একেকিত্ব করেছেন তিনি। সমালোচনা (১৮৮৮), প্রাচীন সাহিত্য (১৯০৭), সাহিত্য (১৯০৭) সাহিত্যের পথে (১৯০৬), সাহিত্যের স্রোত (১৯৪৩) প্রকৃতি প্রচেষ্টায় তিনি প্রমাণ করেছেন, সমালোচনা মূলনোন মহাজাতি সাহিত্যের শিল্পকর্ম হয়ে উঠতে পারে।

যেকে আমরা সাহিত্য-সমালোচনা বলি সাহিত্য বিচার শক্তিকে আমি সেই অর্থে ব্যবহার করছি। আলোচনা অর্থে বৃষ্টি পরিক্রমা, বিষয়টির উপর পায়চারি করে।

enjoyment of literature.” (Raghukul 1986 : 2)। কালে কালে সমালোচনা সম্পর্কিত ভাবনা বদলেছে; সামাজিকতা বা বিভিন্নতা নিয়ে সমালোচনা তবে নানা আকার পেয়েছে। তবে সমালোচনকে সংবদনশীল মন উত্কৃষ্ট শিল্পের উপভোগ-অভিজ্ঞতার রোমাঞ্চকে বর্ণনা দিয়ে যাবেন, সেটা যে পাদতিক বা যে ভক্ষিতাতেই হোক - এটি এক প্রকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সাহিত্য-বিচার বা মূল্যায়ন প্রচেষ্টার ও সেইসাথে সাহিত্যবিচারকের প্রকৃতি কেমন হওয়া উচিত - এ বিষয়ক জিজ্ঞাসা অনেক। সাহিত্য সম্পর্কে মানুষের ধারণা বদলের সাথেই মূলত সমালোচনা-চিন্তার পরিবর্তন সম্পূর্ণ এর প্রেছ সমাজ-সংস্কৃতি-কাঠামোর বিবর্তন দিয়ে। এ সুচেই সমালোচনার কথায় সৌন্দর্যবাদী, বিষয়-রস-আনন্দবাদী, কখনও রূপবাদী, কখনও ব্যবহারবাদী, বৈষ্ণববাদী বা সৃজনশীল হয়েছে।
১৯৮০ খ্রিষ্টপূর্ব বিচার হল পরিচয় - তাকে মাচাই করা। বিশেষ রচনার পরিচয় দেওয়াই সাহিত্যবিশারদের লক্ষ্য। সাহিত্যবিশারদের পরিচিতি সাহিত্যিক পরিচয় হওয়া চাই একথা বলাই বাছাল। কিছু ভাব্য দোষে আমাদের দেশে বাছাকা নয়।
(রবীন্দ্রনাথ, ২০০৪ : ৪৪২)
সাহিত্যবিষয়ক রচনাসমূহে বিশেষত 'সাহিত্যের বিচারক' প্রবর্তকের রবীন্দ্রনাথ সমালোচকের যুক্তিনিষ্ঠ ও মননশীলতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব বা সমালোচনা ভঙ্গি থেকে ধরে নেয়া যায় যে এর কেন্দ্রে রয়েছে আমাদান তথা আনন্দবাদিতা। তাঁর সমালোচনা-সাহিত্য কার্যত এই কথাই বলে যে, ব্যাখ্যা-পরিচয়-বিচার সাহিত্যের সাহিত্যগুলির সঙ্গে যুক্ত হলে সবই সমালোচনা।
বিশ শতকের সমালোচনার চিত্রাবিশ্ব উদিত শতক থেকে ক্রমশই বাচ্চা হয়ে উঠেছিল। নতুন সমালোচনা তত্ত্ব তথা ইতিহাস-সমাজ-সংস্কৃতি-পুরাণ সর্বপরি সাহিত্য সম্পর্কিত নব বীক্ষণ এ যুগের সাহিত্য সমালোচনার দিক পরিবর্তনের সূচক। প্রয়েগের দিক থেকে বাংলা আধুনিক সমালোচনা অনেকটা পাল্পাত্য সম্ভবত যায়। পান্ডাতা রোমান্টিক সমালোচনা অনুমানীর “সমালোচকের প্রথম গুণ হল তিনি যেকোনো সাহিত্যকর্মের ভাবটি (impression) আপন হয়ে এগাছে করতে সমক্ষ; দ্বিতীয় গুণ - সেই ভাবকে আপন করে পাঠকের কাছে উপস্থিত করতে সমক্ষ।” (অরুণকুমার ২০০২ : ১৬)। বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে বাংলা সমালোচনায় নতুনত্ব দেখা দিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলি, মাথু অন্নন্দ, ওয়াল্টার পেটার-এর সমালোচনা-আদর্শের পরিবর্তে আধুনিক ইংরেজি সমালোচক, যথা - টি. এস. এলিয়ট, এজুরা পাউলি, আই. এ. রিচার্ডস, বেন ওয়েলেক প্রমুখের কাব্য-প্রত্যায়, সমালোচনা-ভাবনার চর্চা ব্যাপকতর হলে। প্রথম চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬), মেহেতলাল মজুমদার (১৮৪৮-১৯৫২), দুর্গাত্মক মুখোপাধ্যায় (১৮৫৬-১৯৬১), সুধীরনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬৩), আবু সায়দ আইবাব (১৯০৬-১৯৬২), বুদ্ধিমন্ত্র বসু (১৯০৮-১৯৭৪), বিবৃদ্ধ দে (১৯০৬-১৯৮২) এর প্রমুখের সমালোচনায় সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক মৌলিক জিজ্ঞাসার সময়ে সংস্কৃতি-ইতিহাসের পাঠে সাহিত্যবিশারদের নব নব উন্নয়ন প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশভঙ্গিতে বিশেষত কথার দলের প্রতিদ মনোযোগ, গদ্যপদ্যের নির্বিশর্ষ সাধন, আবেগের পরিবর্তে বুদ্ধিকে প্রাধান্য দান - প্রতৃতি গুণ সমকল্পীন সাহিত্য-সমালোচনায় লক্ষ করা যায়। বক্তত্ব অনেকাংশেই ক্রমে নতুন পথে অগ্রসর বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের গোড়ার কাজ হয়ে উঠেছে। বুদ্ধিমন্ত্র বসু, সুধীরনাথ দত্ত, অনন্দশংস্কর রায়, শঙ্খ ঘোষ, সুরজিৎ দাশগুণ, অজিতকৃষ্ণ চট্টব্র্তী, প্রিয়ামলা সেনসহ বাংলা আধুনিক সমালোচকেরা তাই প্রমাণ করেন। সাহিত্য সমালোচনা সৃষ্টি শিল্পকর্ম হিসেবে প্রত্যা পাঠকের সংবেদনশীলতাকে উত্তোলন উৎকর্ষের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে - বিশ শতকের বাংলা সমালোচনায় সেই সংস্থাবাদী ক্রমায়নে পরিণতি পেয়েছে।
বিভিন্ন বিষয়ের সমালোচনার মুখ্য উপাদান হলো সাহিত্য, যা দেশ-বিদেশের বাঙালির জন্য সক্রিয় বিষয়। এটি মানুষের জীবন এবং সামাজিক পরিবর্তনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো সাহিত্য বিভিন্ন পাঠ্যক্ষেত্রে।

পূর্বে মানুষের জীবন এবং সাহিত্যের ইতিহাস রচনা বা মূল্যের এর পরিবর্তনের জন্য সাহিত্যের অবদান রয়েছে। এটি বিভিন্ন কার্যক্ষেত্রে সমালোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

নবাব রাজা এবং সাহিত্যের প্রাচীন তথ্যে বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যের প্রকাশ করেছেন। স্বল্প সাহিত্যের দৃষ্টিতে সাহিত্যের প্রকাশ করেছেন।

আবদুল হাদেম (১৯২২-২০০২), মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১), আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯), হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩), আবদুল মুনিরজামান (১৯৩৯-২০০৮), আবদুল হাফিজ প্রমুখ। সাহিত্যের বিভিন্ন তত্ত্বে বিভিন্ন শব্দে উপলব্ধি রয়েছে।

আবদুল মানান (১৯৪৩-২০১০) যাদের দৃষ্টিতে মুনীর চৌধুরী যে কিছু বিভিন্ন শব্দে উপলব্ধি রয়েছে।
রচনাতেই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সবচেয়ে বেশি লিখেছিলেন প্রবন্ধ বা সমালোচনা-প্রবন্ধ। এর মাঝে বাংলাদেশের রচিত গবেষণাপত্রও রয়েছে। সাহিত্য বিশ্বের উল্লেখযোগ্য অনেক লেখকের সালেটেনারা করেছেন তিনি। তার আলোচনা থেকে কম গৌরবপূর্ণ লেখককে বাদ পড়েননি। বিশেষত কবি ও কবিতা বিষয়ে তাঁর রচনাপ্রার্থনা ও বৈচিত্র্য তুলনাহীন ছিল।

আবদুল মালিন সৈয়দের প্রবন্ধ গ্রহণের বিষয় হলো: নির্বাচিত প্রবন্ধ প্রথম খণ্ড (১৯৭৬) ও দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৮৭), নজরুল ইসলাম: কবি ও কবিতা (১৯৭৭), করতল মহাদেশ (১৯৮৯), দশ দিগন্তের তীর্থা ব্রহ্ম (১৯৮০), বেগম রোকেয়া (১৯৯৩), আমার বিশ্বাস (১৯৮৪), হুসেন (১৯৮৫), সৈয়দ ওয়ালীুদ্দার (১৯৮৬), নজরুল ইসলাম: কানুন ও কোলাম্বর (১৯৮৭), চেতনায় জীবন নিয়ে শিশুর পাতা নড়ে (১৯৮৯), পুনর্বিবেচনা (১৯৯০), দূর্বল পর দূর্বল (১৯৯১), ফরুখ আহমদ: জীবন ও সাহিত্য (১৯৯৮), বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা (১৯৯৪), বাংলা সাহিত্যে মুসলিম (১৯৯৪), রবীন্দ্রনাথ (২০০১), আধুনিক সামাজিক (২০০১)।

সৈয়দের সমালোচনা-চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অনেক প্রবন্ধেই; এছাড়া তাঁর সমালোচনা-বিষয় থেকেও তা কিছুটা অনুমান করা যায়। তবে বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা গ্রহণে স্বাধীন পাওয়া করে এর প্রকাশিত সমালোচনাসমূহ সাহিত্যিকতায় বিশেষরূপে বিখ্যাত হয়েছে। তাঁর প্রদত্ত বিষয় হলো: 'সমালোচনা' (১৯৮৭), 'সমালোচনার সামাজিক দায়' (১৯৮৮), 'সমালোচনার সমালোচনা' (১৯৮৯)। এই প্রবন্ধগুলোতে তিনি সমালোচনার একটা সংজ্ঞায়িত নিয়ম করতে চেয়েছেন এবং সমালোচনার উদ্দেশ্য, সাধারণ পাঠক ও সমালোচকের পার্থক্য, আদর্শ সমালোচকের লক্ষণ, সমালোচনার তাত্ত্বিক রূপ-প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। এছাড়া বাংলা সমালোচনা-ধারায় একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও রয়েছে উল্লিখিত প্রবন্ধের একটিতে। সাহিত্য-সমালোচনা বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে নমনুত্তরিকেরা নানা মত পোষণ করেছেন। সাধারণত সমালোচনার প্রকৃতি বা গোলা চিহ্নিত হয়ে থাকে একজন সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে। সাহিত্যিক মূল্যমান বিষয়ে মতান্তর প্রকাশ করতে গিয়ে সমালোচনার বারুপ বিষয়শ্রেণী আবদুল মালিন সৈয়দ লিখেছেন:

সমালোচনা সাহিত্যের একটা পরিপক্ষ।... বিশ্ব সমালোচনা বলে কিছু নেই, নির্বিশ্বক সমালোচনা বলে কিছু নেই।... সমালোচনা অবিশ্ব, ধরাবাহিক, পারস্পর্যোগ্য। (সৈয়দ, ১৯৯৪ : ১)

সমালোচনা সৃজনকাজে আটলীল গতি দ্যায়, রূপপথা দ্যায়, অতীত ও ভবিষ্যতের সংগত বর্তমানের শিল্পকর্মকে মেলায়। (সৈয়দ, ১৯৯৪ : ১)

কৃতিসমালোচনার আর কোন সৈয়দ পরিমাপকা দেওয়া কিছু নেই। সমালোচনার সিদ্ধান্তকাজ বিচার-বিপ্লবমূলক,
সৃষ্টিশীল, মূল্যবিচারমূলক সব অভিধাই দিতে চেয়েছেন তিনি। ব্যাখ্যা, বিচার, রস-
পরিচয় সাধারণভাবে এই তিনকে নিয়ে সমালোচনার সমগ্রী বলে ধরে নেয়া যায়।
তবে সমালোচনায় এই তিনেরই স্বতন্ত্র ভূমিকা রয়েছে। সমালোচনা কি বিশেষণ না
অন্যকিছু সে প্রসঙ্গে মানুষ সৈয়দ বলেন:

মন্ত্য বলে সমালোচনা নয়, সমালোচনা মানে বিশেষণ। সে বিশেষণে রচয়িতার
অর্থপ্রকৃতি বিশেষিত হয় না, হয় তার সমকালীন দেশ-কালে, তার
ধারাবাহিকতাতেও। (মনোন, ১৯৯৪ : ৭)

আবার সমালোচনা রচনাবিশেষের মূল্যায়ন হলে তা বিচারপ্রতী কিনা সে ব্যাপারে মত
প্রকাশ করে মানুষ সৈয়দ লিখেছেন:

...সমালোচনার ক্ষেত্রে বিচারের একটি বিষয় এসেই যায়। মান নির্ধারণ ও
সমালোচককে করতে হয় - কখনো প্রত্যক্ষত, পরামর্শ কখনো। ...সমালোচককে
হতে হয় দিবালোকের মতো স্পষ্ট। (মনোন, ১৯৯৪ : ৩)

তবে এই বিচার বলতে সাহিত্যমূলকই বিচার বোঝাতে চেয়েছেন মানুষ সৈয়দ,
নৈতিক সামাজিক বা অন্যান্য মূল্যের নয়। সমালোচনা বিষয়ে তাঁর অন্য বক্তব্য থেকে
বিষয়টি বোঝা যায়। সমালোচনায় বিজ্ঞান কতগুলু দরকার এই পর্যালোচনাওতার
প্রবন্ধে আছে। সমালোচক হবে বৈজ্ঞানিককের মতো নিষ্পত্তি বা ব্যক্তি রুচি ও
মানসিক প্রবণতার উর্ধচ্চারী, আদর্শ সমালোচকের বৈশিষ্ট্য নুরুণে এমন প্রসঙ্গ
উপাধিত হয়েছে। মানুষ সৈয়দ মনে করেন:

সমালোচনা ব্যাপারটা পুরূরপুরি যুক্তিবাদী নয়, প্রায় যৌথকিক, পুরূরপুরি বৈজ্ঞানিক
নয় - বিজ্ঞানসমত । 2+2=৪ - সাহিত্যের মত সমালোচনায় এরকম সমীকরণ
ঘটায় না - কেন বর্ণনায় ধরবে তাকে সমালোচক?... শেষ পর্যন্ত তাকেও জীবনের
অতীতের রহস্যে মূখ্য ও বিস্মৃতি ও নির্দেশ হতেই হয়। (মনোন, ১৯৯৪ : ২)।

সমালোচনার পেছনে কিছু বৈজ্ঞানিকতা থাকলেও সাহিত্যবিচার যে মূল্য শিল্পকূস্ত,
এবং নিদিষ্ট কোনো মাপকাঠিতে চরিতার্থ ধরাকমে দেখতে
সমালোচনা যে চলতে
পারে না, মানুষ সৈয়দের বক্তব্যে তা স্পষ্ট হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

সৃষ্টিশীল রচনা ও সমালোচনা একই জিনিসের দুরকোষ্ঠ উৎসারণ। ... যদি সৃষ্টিশীল
রচনা বিশ্বচর্চারকে প্রতিবিধিত করতে গিয়ে সৃষ্টিশীল রচনা হিসেবে পরিগণিত হয়,
তাহলে সমালোচনা - যা সৃষ্টিশীল রচনার একটা তর্কিত্ব প্রতিবিধি - তাও কেন
সৃষ্টিশীল হবে না? শেষ-পর্যন্ত সৃষ্টিশীল রচনা ও সমালোচনা দুই-ই সৃষ্টিশীল রচনা।
সৃষ্টিশীল রচনার মধ্যে রচয়িতার ব্যক্তিত্বের অভিকে ঘটে। সমালোচনার মধ্যেও
সমালোচকের ব্যক্তিত্ব বিকৃতিতে হয়। তার ফলেই তা চরাচর ও সমালোচনা
ঠেকে একটু পৃথক হয়ে যায়, আলাদা এক শিল্পরূপ ধারণ করে। (মনোন, ১৯৯৪ : ৯)
সাহিত্য-বিচারকে কেবল সৃষ্টিশীলতাই মনে করেননি মানুষ সৈয়দ, মনে করেছেন অনুসৃতি।

মানুষের নির্মাণ নয় - সৃষ্টি। ঠিক সৃষ্টি নয় - অনুসৃতি। ইশ্বর বা প্রকৃতির সৃষ্টির সমাপ্তরালে কবি বা লেখক সৃষ্টিকরেন; আর কবি বা লেখকের সৃষ্টি অবলম্বন করে সমালোচক করেন অনুসৃতি। (মানুষ, ১৯৯৪ : ৫)

সমালোচনা হচ্ছে তৃতীয় নির্মাণ। প্রথম নির্মাণ জীবন, যে-জীবনের কোনো বিকল্প সম্ভব নয়। দ্বিতীয় নির্মাণ সৃষ্টিকর্ম, যা সরাসরি জীবন থেকে পরিগ্রহণ করে। সমালোচনা তৃতীয় নির্মাণ, কেননা সৃষ্টিকর্ম ও জীবন দুয়ের সঙ্গেই তার বিনিময় চলে। বিনিময়ই তাকে সমাজমন্ডল করে, নির্জন, একাকী, বিবির্জিত থাকতে দায় না। লেখক এর সমালোচনা সম্ভব, যা শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের তুলা বা প্রতিষ্ঠিত। (মানুষ, ১৯৯৪ : ৭)

আবদুল মানুষ সৈয়দ তাঁদের মধ্যে একজন, যিনি দৈনন্দিন-সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্য-বিচার করেছেন। এ সূত্রেই একজন প্রকৃত সমালোচকের সংজ্ঞায় নির্মিত করতে চেয়েছেন তিনি; উৎকৃষ্ট সমালোচকের দায়িত্ব বাক্যা করেছেন নানা যুক্তির অবতারণ করে। তাঁর মতে, সাহিত্য-বিচারকের প্রধান গুণ ভাবে লেখা শনাক্ত করার মত সংবেদনশীলতা। অর্থাৎ সমালোচক হবেন রুচিশীল, নির্বাচন-ক্ষমতাসম্পন্ন। “সমালোচকের এক প্রধান কুশলতা নির্বাচন। ...শান্তিকরণ সমালোচকের এক প্রধান শক্তি ...এও অনেকটা জীবনের মতো ব্যাপার।” (মানুষ, ১৯৯৪ : ২)। অর্থাৎ অজ্ঞান লেখার মধ্য থেকেও অভিনব ও কার্যকর্তা হওয়ার যোগ্য বা চরিত্রের আবাসযুক্ত সৃষ্টিকে সমালোচক বেছে নিতে সক্ষম হবেন বলে তিনি মনে করেন। যদিও ভাবে লেখা দেখেই সাধারণত সমালোচকের মুখে চিনতে পারেন - এর পেছনে তিনি কোনো দৃষ্টিভঙ্গি, মূলায়নের কোনো বিশেষ ভঙ্গকে নয়, বরং দায়ী করেছেন সমালোচকের উপরে থাকা এক অনির্দিশ বিশ্বায়ক। সমালোচকের অর্থও গুণ হলো - “অনুভূতিকে তিনি যুক্তি ও চিন্তার ভাষায় সারঘর্ষ অনুমান করতে সক্ষম; তার নিজের মধ্যেই রয়েছে গভীর বোধ ও সংবেদন অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা।” (মানুষ, ১৯৯৪ : ৪)।

তাঁর মনে যে কবি বা লেখকের মতো সাহসী একজন কবি বা লেখককে ঘিরে আক্রমণ জাগ্রত করেন সমালোচক। একজন সৃষ্টিশীল কবি বা সৃষ্টিশীল লেখকের মতোই সমালোচকের বন্দন্ত সৃষ্টিশীল। তাঁর চরণ অকান্ত, অপরিবর্তনীয়, অমোধ। (মানুষ, ১৯৯৪ : ৫)। সমালোচককে সৃষ্টিশীল বলার অর্থ হলো স্পষ্টর চরণা এবং সমালোচকের দৃষ্টিতে স্পষ্ট। সমালোচকের এই অংশের শেষ কিছু শিল্পী হিসেবে নয়, সমালোচক হিসেবে।” (মানুষ, ১৯৯৪ : ২)।
সমালোচনা হবে সাহিত্যগুলোর সমৃদ্ধি, তাই সমালোচনাকে হতে হয় সংবেদনশীল। “তথ্য ও তত্ত্ব, যুক্তি ও প্রতিযুক্তি, চিত্তা ও সংবেদন : এসব পৃথিবীতে পারে। সমালোচক। ... আসলে তাকে হতে হয় একাধারে মাননিক ও হাস্যিক। মনন ও হৃদয় - নিচুক মনন নয় - কিন্তু কখনো মননবর্জিত নয়।” (মাল্লী, ১৯৯৪ : ৩)

এদিক থেকে বিণ্ঠাতেও সমালোচকের বড়ো গুলি বলে উল্লেখ করেছেন তিনি; বলেছেন তাঁর আদর্শের বা প্রত্যায়ের কথা। “সমালোচকের তো আদর্শবান, যে আদর্শ তাঁর পাঠ প্রতিষ্ঠা, অনুষ্ঠান, অভিজ্ঞতার একটি কেলাসিত রূপ। প্রত্যেক সমালোচক তো অনন্য হ'য়ে রাখেন তাঁর এই আদর্শ থেকেই। ...সম্পর্ক নৈতিক যিনি, তিনি সমালোচক নন।” (মাল্লী, ১৯৯৪ : ৪) “সাহিত্যের একজন পুরোপরি সঠিক মাত্রার উপযোগী সমালোচকের জন্য কখনও হয়নি, আর তা সম্ভবও নয়”- সমালোচকের থুমিকা বা যোগাযোগ মত-ভিত্তিতা প্রস্তুতে মন্ত্রাব্যটি করেছিলেন E. E. Kellet। (Raghukul, 1986 : 10) মাল্লী সৈয়দ সমালোচক বিষয়ে প্রাচ্য ও পারস্যের উৎকৃষ্ট সংক্ষেপ একটা সমস্যায় করে তা সমর্থনের চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর নিজের অভিমত অস্বীকার আচ্ছে, আরো রয়েছে কোনো কোনো মতাদর্শের প্রতি ঐকান্তিক আত্মসংরক্ষন।

সমালোচনার দায়বদ্ধতা বিষয় সামাজিক দায় - এ প্রস্তুতে লিখেছেন মাল্লী সৈয়দ। সাহিত্যে মূল্যবোধের বিচার বা সমালোচকের সামাজিক দায়িত্ব ও নীতি-নির্দেশনামূলক ভূমিকার উপযোগীতা নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। এ বিতর্কের মুখ্য বিষয় হলো - সমালোচককে নিরপেক্ষ বিচার করতে হবে নাকি প্রয়োজন মতো সামাজিক চেতনাকেও সজ্জার রাখতে হবে। এ প্রস্তুতে মাল্লী সৈয়দ স্পষ্টই জানিয়ে দেন যে, সমালোচকের সামাজিক দায়বদ্ধতা শিক্ষক, নীতিবাদী বা উপদেশবাদীর মতো নয়; নির্দেশনাপূর্ণ নয় - এই দায় নীরব, অস্তিত্বহীন কৃষ্টি সর্বব্যাপী। তিনি লিখেছেন:

সমালোচনা মানে বিশ্লেষণ। সে বিশ্লেষণে চর্চিতার অন্তঃপ্রকৃতি কেবল বিশ্লেষিত হয় না, হয় তাঁর সমকালীন দেশ-কালও, তাঁর ধারা-বিভিন্নতাতেও। সেজন্য সমালোচনায় একটি সামাজিক দায়িত্ব উদ্ভাবিত হয়। সাহিত্যের সত্য কোনোদিন কোনো চলিতে সামাজিক সত্যের বিরোধী হতে পারে না - অস্তিত্ব অর্থে।... সমালোচনা জীবনরুপী এক ব্যাপার। সৃষ্টির সমালোচনা ব্যাপারটাই সামাজিক ব্যাপার। সমালোচনা সামাজিক। আজকের দিনের কবিতা বা গল্প অনেকশ্বরী বাণিজ্যিক। কিন্তু কবিতা বা গল্পের সমালোচনা সামাজিক। (মাল্লী, ১৯৯৪ : ৭)

এই সামাজিকতা অবধি মাল্লী সৈয়দের কাছে মূল্যবাহিত বা মূল্যবিন্যস্ত সংক্রান্ত নয়। এটা সমালোচনার মধ্য দিয়ে নতুন এক ধরনের সৃষ্টির অনুভূতির বা উপযোগীতা তৈরির পদক্ষেপ।
সাহিত্যে বিষয় বড়ো না রচনার রূপ বড়ো - এ নিয়ে বিরত দীর্ঘকালের। বিষয়বাদী 
সাহিত্য-বিচারক সাহিত্যের বিষয়-উপাদান বা content-এর ওপর বেশি গুরুত্ব 
আরোপ করেন। আর রূপবাদীরা জোর দেন প্রকাশের প্রকরণ বা expression-এর 
ওপর। ভারতীয় অলঙ্কারশিল্পে সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও রীতির মহাত্মাস সমভাবে 
ব্যাখ্যা করা হয়েছে।' কারণ বক্তব্য উপাদান ও শিল্পরূপের সমস্যাসহ সাহিত্য-রস ও 
সৌন্দর্যের উৎপত্তি হয়, তাই সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও শিল্পরূপ হলো রসনিষ্ঠার 
সমর্থী কারণ একাধিক ধরে যেতে যায়। এ প্রসঙ্গে আবদুল মালান সৈয়দ তার বক্তব্যে 
কিছুটা ধরিয়েছিলেন যোগ দিয়েছেন। তবে শেষপর্যন্ত তিনি ভারতীয় আলংকারিকদের 
মতাদর্শেই বিষয় ব্যক্ত করে বলেছেন:

নিহিততার সংস্থা সমালোচনার প্রধান কাজ। রূপ-কে সমালোচনা অপার করে না, 
কিন্তু তার অজ্ঞাত গতির আত্মা। যে সমালোচনা আত্মা কারণ করতে পারলে 
না, তা বুঝা। অধুনাক সমালোচকের কাছে আধার ও আধারে চুলামুলতা। বিষয়বাদী 
সমালোচকের আধারকে অপার করেন অনেক সময় - কেননা তিনি জানেন না 
আধারেও আত্মা আত্মা লেগে থাকে। তাহাত্মবাদী সমালোচক আধারকে অবজ্ঞা 
করেন অনেক সময় - কেননা তিনি জানেন না রূপবিনীত হাজার সিংহের পেরিয়ে 
কেন্দ্রীয় মনিয়ে পৌঁছানো না-পেলে সবই বুঝা। একজন বিদ্যুষ কবি-সমালোচ 
লিখেছেন, 'কবিতার ইতিহাস তার টেক্সটের ইতিহাস।' কিন্তু কবিতার ইতিহাস 
তার আত্মারও ইতিহাস। আত্মার কী চিরকাল এক থাকে? একটি-একটি কী পাল্টে 
যায় না? কবিতার ইতিহাস তার আত্মার ইতিহাস। (মালান, ১৯৯৪ : ১-২)

অর্থাৎ খামার নয় সাহিত্য বিষয়বস্তু-রূপ দূর-ই অনুসন্ধান করেন সমালোচক। 
সাহিত্য বিশেষত কবিতার ক্ষেত্রে বাক্প্রতিমার বিচার যে কারণে গুরুত্বপূর্ণ তার 
বিশেষণ ব্যাখ্যায় দিয়েছেন তিনি। শিল্প ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

কবিতা একটি শিল্প। হ্রদ একটি বিজ্ঞান। কবিতা বৃত্তাকৃতি অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার 
প্রকাশ। ... বিশ্লেষণ সমস্ত বৃত্তাকৃতির তলায় তলায় যেমন নিয়মের ধারা বইহ, 
তেমনি কবিতা ও শিল্পকর ভিতরে-ভিতরে চলেছে নিয়মের নিহিত নদী। ঐ 
নিয়মের ধারাই কবিতার বিজ্ঞান তথা হ্রদ এবং রূপবক্তা। ... কবিতা হ'ং ওঠায় 
চন্দ কোনা বুঝা নয়, নয় তো সেই উপায়। ... হ্রদ কবিতার শরীরী রূপ। কিন্তু 
শেষ পর্যন্ত হ্রদ কবিতার শরীরকে অতিরিক্ত করে যায়। শেষ পর্যন্ত হ্রদ কবিতার 
আত্মাত। শরীর ও আত্মায় কভু নিরোধ কবিতা ও হ্রদ তেমনি একাত্ম। ওদের 
একটি থেকে অন্যটিকে আলাদা করে ফেলা যায় না। (মালান, ২০১৫ : ২৩৩)।

মালান সৈয়দের সমালোচনা-ভাবনা পর্মালোচনা করে বেশ যায় যে সমালোচনা 
বিষয়ক প্রাচীন-নবয়তুমের গতির অধ্যয়ন ছিল তাঁর। সমালোচনার শ্রেণি বা 
গেজেতেরচিহিত হয়েছে সাহিত্য-বিচারের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও ক্ষেত্র অনুযায়ী। 
আবদুল মালান সৈয়দ বিচার বিষয়ক মতাদর্শের বিভিন্ন দিক নির্দেশ করেছেন, তা 
পর্যালোচনা করেছেন, কোনা কোনাটিতে তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। তাঁর
বক্তব্যকে ঘিরে কোথাও কোথাও একটা অস্পষ্টতাও সৃষ্টি হয়, কেননা সাহিত্যকৃতি বিশ্লেষণ এবং এ গোপনকের বাণিজ্য ও বৈচিত্র্যের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন সুসম্পূর্ণ পথনির্দেশ না করেই। তবে সাহিত্যের নাদনিক মূল্য আবিষ্কার করাকে তিনি কোনো বিশেষ মতবাদ, গোষ্ঠীবদ্ধতা, বিষয় প্রতিষ্ঠান বা পরিবেশের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ বাণী বেলেও করেছেন। বলা যায়, সাহিত্যের আর্থাদানপন্থী সমালোচক পাই (যাকে বলে appreciation) চূড়ান্তভাবে কামনা করেন তিনি।

চার
আবদুল মালান সেন্দার উনিশ-বিশ শতকের সমালোচনা-তত্ত্ব সম্পর্কে অবিস্মরিত ছিলেন। এ বিষয়ে পাঠ পাঠানও ছিল তাঁর। সাহিত্য-বিচারে সাহিত্যের আনুদ্ধীনিত্ত অর্থকরণের গুরুত্ব আরও এক কাছে সবচেয়ে বেশি বলে মনে হয়; বিচার বিশ্লেষণ সেখানে রয়েছে, রয়েছে মান-নির্ধারণ। কিন্তু মালান সেন্দারের শিক্ষা বিষয়ে সমালোচনা-দৃষ্টি কেন্দ্রের হলো সুরসন্ধীলতা, বর্তমান অনুদ্ধীন ইত্যাদির সমস্যায় সমালোচনায় এক নব-নির্মাণের পরিণত করা। তাঁর নিজের করা সাহিত্য-সমালোচনা নিয়ে তিনি করেক জ্ঞানগার বাণ্ডা দৃষ্টিকোণে বক্তব্য দিয়েছেন। সমালোচক হিসেবে নিজের যাত্রাপথ তথ্যও দিয়েছেন তিনি। বিবেন্দ্র-পুরুষবিবেন্দ্র গ্রন্থের 'অর্থবিশ' অংশে তিনি লিখেছেন:

ঠিক ১৯৬৫ সালে আমিস সমালোচক হিসেবে অতীত হই। সুধীরনাথ দত্তের কবিতা ছিলো আমার প্রথম সমালোচনা বিষয়। আমি আমার কলেজ-জীবন থেকে সুধীরনাথের কবিতা পড়ে অস্তইলাম সাদৃশ্য মুল্যীকৃত। (মালান, ১৯৯৪ : উনিশ)

কবিতার ভেতরের থাকা ‘গোপন অমোচ জাদু’ বা কবিতা পাঠের মুখ্যতা এবং পাঠকের মনে ‘কবিতার শাস্ত্রী ভূমিকা’ (মালান, ১৯৯৪ : বার) জন্যই কবিতায় সবসময় অপূর্ব হয়েছেন মালান সেন্দার, তাঁর কবিতা সমালোচক কারণও তাই। নিজের সমালোচক সত্য পড়ে ওঠার অভিজ্ঞতাও বর্ণনা করেছেন মালান সেন্দার:

জীবনের সঙ্গে সাহিত্যকে প্রিয়-নিয়েছি ক্রমাগত। বাংলা ও বিদেশী সাহিত্যের বহু লেখকের কাছ থেকে নানাকর্ম অনেকের জীবন ভরেছে আমার। শেষ পর্যন্ত রূপের মুক্তি সমালোচনা-কর্ম নিজেই অর্ধায়ন, তথ্য ও তত্ত্বের সহায়তায়। সমালোচনাকে মনে লেখতে হলে হৃদয়ের পথ প্রায় ভ্রমণে অগ্রসর হ’তে হয়। (মালান, ১৯৯৪ : বিশ)

সাহিত্য-সমালোচনায় আমি সৃষ্টিধরা কাজ বলেই মনে করি। সৃষ্টিধরা আনন্দেই প্রবন্ধ লিখি - সমালোচনা লিখি - এমনকি পরিষেবাও করি। আমার কবিতা মেমন আবেগের আকর্ষিততার উৎসর্গ, প্রবন্ধ-সমালোচনার উত্সর্গ সেই মৌলিক ভাববোধের সাদৃশ্য। এই অভিজ আবেগের সংক্রামে আমার কবিতায়-গল্প-প্রবন্ধে অতীত হয়ে আছে - আবার তা থেকে রূপকের বিশেষতায় একটি প্রমুখিত। (মালান, ২০০৯ : ৯)
বাংলা কবিতা-কথাসাহিত্যে জোটগঞ্জ অর্থাৎ সাহিত্যের নানা দিক বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। সমকালীন বাংলা সামালোচনা সাহিত্যের প্রচলিত পথের বাইরে ছিল তাঁর সামালোচনাগীর্জন ও উদ্ভিদবোধ সামালোচনা-যুগ জীবনানন্দ দাশ বিশ্বকর্মা গবেষণা এর্গুদতম কবি (১৯৭২)। । “সুদতম কবি নিচুক গবেষণা এর্গুদতম মাত্র ছিল না। অধ্যায়কীয় সামালোচনা-সাহিত্যের একটি দৃষ্টাংশ ছিল। বাংলাদেশের সাহিত্যের রূপান্তরের সামালোচনা এই স্বর্ণ দৃষ্টাংশের এ আগে ছিল না।... পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য তখন পর্যন্ত জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে ঐতিহ্য হয় নি। (মাইহার, ২০১২ : ৫৪)। একেল জীবনানন্দ নন, রবীন্দ্রনাথ, মানিক বদ্যভাষায় ও নজরুল গবেষণায় তিনি প্রাথমিক হয়ে উঠেছেন।”বাংলাদেশ যারা নজরুল নিয়ে সৃষ্টিকর্ম, তথ্যপূর্ণ, নতুন, ইতিহাস-সংগ্রহ, ও মানিক মূল্যযান করতে পারতেন আব্দুল মানন সৈয়দ তাঁদের অন্যতম। তাঁর জীবনানন্দ দাশ-বিশ্বকর্মা কাজও অত্যন্ত পূর্ব।” (অনু, ২০১৫ : একুশ)। এছাড়া “রবীন্দ্রনাথ নান্দিক বিবেচনা ও বাঙ্গালি মুসলমান সাহিত্যের জীবনস্তরি পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রব্যাখ্যায় আব্দুল মানন সৈয়দের ভূমিকা উল্লেখ্যোগ্য।” (মাইহার, ২০১২:৫৬)। রবীন্দ্রনাথ (২০০১) নামক গ্রন্থটি ছাড়াও তাঁর রবীন্দ্র-বিশ্বকর্মকে অন্যতম চরণ রয়েছে। সংকলিত প্রথম প্রবন্ধ ‘দৌলাচ্ছল বিশ্বাস চলছিল’-তে আব্দুল মানন সৈয়দ বলেছেন।

...রবীন্দ্রনাথ যেমন বহুমুখী বহুআকার তেমনি সদাউদিয়মান ও চিরচলিত। ...রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাচীন শিল্পক্ষেত্রে নিজের ধরনে একটি সম্পূর্ণতা দিয়েছেন। (উক্তি, মাইহার, ২০১২ : ৫৬)

বাংলা সাহিত্যের অবলম্বিত, কম অবলম্বিত বা সমসাময়িক গৌণ সাহিত্যের প্রায় সমান মনোযোগ বিশ্লেষিত হয়েছেন মানন সৈয়দের লেখায়। মাইকেল মহুদান দত্ত, মীর মহারফর হোসেন, মোহিতলাল মজুম্দার, জগদীশদাসী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত,
বুধবার বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন, জগদীশ শোভা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, কাজী ইমামদৌল হক, সিকান্দার আবু জাফর, আহসান হায়েব, হাসান হাফিজুর রহমান, কাজী মোতাহার হোসেন - মারাত্মক সাহিত্যবিদের সাহিত্য-বিবেচনার এই তালিকা আসলে আরো দীর্ঘ। উল্লেখিত লেখকগণ ছাড়াও অ্যাড়েস-সমকালীন-অনুজ অন্যের লেখক সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা সমান গতিশীল থেকেছে। বিবেচনা-পুনর্বিবেচনা গ্রন্থের 'পরবর্তী' অনুসারে এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

আমি ও বিশ্ব শাসনীর প্রেষিত এবং প্রতিষ্ঠিত লেখক-কবির রচনা বিশেষ্য-মাত্রা-আলোচনা করেই কাপুর হইলে, আমার কারণে তাঁর লেখকের বই-এর আলোচনা করে চলেছি গত তিন দশক ধরে। বহি'-দূরত্ব সৎ-সমালোচনার জন্য প্রয়োজন, বই রিভিউ করতে গিয়ে তা পাওয়া যায় না বটে - কিন্তু সমকালীন লেখকের প্রতি একজন সমালোচকের দায়িত্ববোধ থেকে এমন সমালোচনা করেছি। সমকালীন একজন পাঠকের চিন্তা এই কারণে কোনো বই কী প্রতিষ্ঠিত আলাদি হবে তাঁর নমুনা হিসেবে এগুলোক ভুলে পত্রিকায় পৃষ্ঠা থেকে তুলে এনে একটি গ্রন্থের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী আশ্রয় দেওয়া হবে।

কর্তব্যলেখ মহাদেশ প্রতিটি 'আমাদের কবিতার চারদিক' প্রবন্ধে মালামাল সৈয়দ বাংলাদেশকে দ্বিতীয় কবির, বিশেষত খাটের দশকের ও সাধারণ-উত্তর পর্বের কবিতার রূপরেখা বিচার করেছেন। সমকালের কবিতা-সংকলন, পত্রিকা সম্পাদক ও কবিতা বিষয়ে বিশেষভাবে মাত্রারক বাংলাদেশের কবিতাধারার ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন তিনি। খাটের দশকের প্রথম হয়েছে উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু লিটল ম্যাগাজিন, যেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- রফিক আজাদ সম্পাদিত 'স্যাক্র' (প্র. প্র. ১৯৬৩), জ্যোতির্প্রকাশ দত্ত ও হয়া-ত মামুদ সম্পাদিত 'কালেবল' (প্র. প্র. ১৯৬৫), উদ্যান ইকবাল সম্পাদিত 'পূর্বলেখ' (প্র. প্র. ১৯৬৬), আবুদুল্লাহ আবু সৈয়দ সম্পাদিত 'কঠিন' (প্র. প্র. ১৯৬৫) এবং আরো অনেক। এই ম্যাগাজিনগুলোকে কেন্দ্র করে স্মকালীন প্রতিষ্ঠিতশীল কবিবর্গ একত্রিত হয়েছিলেন।” (মালামাল, ২০১৫ : ১৪৭)। এছাড়াও সমকালের কবিতা-সংকলনসমূহে কবিতা-চটার অংশটি গ্রন্থপূর্ণ দেখা যায়। কেননা, সৈয়দের মতে, “সংকলন মানেই সমালোচনা...একটি সংকলন থেকে সংকলনীয় সাহিত্যরুটি, জান ও প্রাক্টিকার আশ্রয় দেওয়া যায়। এদিক থেকেই কোনো-কোনো সংকলনের সমালোচনার সমান মূল্য দেওয়া হচ্ছে।” (মালামাল, ২০১৫ : ১৪৭-১৪৮)। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন:

(টাইটো সবর দশকের) এই কবিতা সংকলনসমূহে বাংলাদেশের কবিতা পরিপূর্ণ বিষুবীয়। যদিও কেউ বাংলাদেশের কবিতার ধারাবাহিক গতি আর তার পরিশ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করেন, তাহলে এই সংকলনগুলো থেকে তার ঘনিষ্ঠ আন্তরিক পরিচয় পাবেন। এখানে আছে প্রত্যক্ষ কবিতা আর উজ্জল মেধাবী উপস্থাপনা। এই
কবিতাগুলি প্রমাণ করবে বাংলাদেশের কবিতা আবহাওয়া বাংলা কবিতার উত্তরসাধক 
আধুনিক বাংলা কবিতার সময়বাদী, যুক্ত ও স্বতন্ত্র। (মায়ার, ২০১২ : ৫৫)

সমকালীন কবিদের কবিতাধারার একটা ইতিহাস-চিত্র রূপায়ণের পাশাপাশি একজন 
প্রকৃত কবিতা-সমালোচকের মতোই কবিতার অর্জনকৃত, কবিতার রূপপ্রাপ্তী এবং 
পরিশ্রেষ্ঠত্বের সাথে যুক্ত করে কবিতাভাবে নির্মাণ করেছেন তিনি। কবিতার মতো 
আত্মৃত কর্ম কীভাবে শেষপর্যন্ত বহির্ভাবারের সঙ্গে যুক্ত, সেই মূল্যায়ন তিনি 
করেছেন একজন সৃষ্টিশীল কবি হিসেবেই। আবদুল মায়ার সৈয়দের কবিতা-বিচার 
সম্পর্কে সমালোচক লিখেছেন:

কবিতার রস আমাদের তিনি মুক্তপ্রাণ গদা লেখক। আবদুল মায়ার সৈয়দের 
প্রাদানিক সত্য এই হচ্ছে এক বড় দিক। কবিতার সৌন্দর্য সন্ধানে তিনি অবলম্বন 
করে সমস্ত বাংলা কবিতার অক্ষ ভূগোলকে। ... বাংলা ভাষার প্রধান কবিদের 
প্রায় সকলই তাঁর কল্পনা বিশেষণ ও বিশেষার্থ রয়েছে। এর সূচনাপ্রস্তুতে যেমন 
রয়েছে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তেমনি রয়েছে সন্ত্রাসিকতম কবিগণও। 
(মায়ার, ২০১২ : ৫৫)

তাছাড়া শিল্পদৃষ্টিতে আধুনিকতায় পক্ষের হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যিক সিদ্ধি পাওয়া 
লেখক কমাতেই শিল্পবিশেষজ্ঞার আর্থনগত কর্ম নিতে পেরেছেন তিনি। “এখানে তাঁর 
প্রাদানিক সত্য বড় হয়ে ওঠে সংক্ষিপ্ত আধুনিকতায় দায়বদ্ধ শিল্পবিশেষজ্ঞ প্রচলন পথ 
থেকে।” (মায়ার, ২০১২ : ৫৫)। সমালোচনার ভাষারপ সম্পর্কে মায়ার সৈয়দ 
উচ্চারণ পোশাক রয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর মৌলিক বক্তব্য ছিল। তিনি মনে 
করতেন, ‘কি বলছি তাঁর মতোই তাপ্ত্রপুর্ণ কীভাবে বলছি’ তাঁর মতে, 
সমালোচনার ভাষা হবে বৃহৎ ‘আমার গদা’ (আমার বিশ্বাস যথাযথ) নামক লেখায় 
তিনি বলেছেন:

গদারকে প্রকাশ বলতে আমি বৃষ্টি শুধু ব্যবহারের ধরন, বাক্য নির্মাণের কৌশল, 
অনুচ্ছেদ তৈরির পদ্ধতি, এককথায় সম্পূর্ণ রচনাটির গঠনকলা।

আমাদের দেশে যেহেতু সমালোচনা-সমালোচনামাঠই একাংশভাবে বিষয়নির্দেশ; 
কাজেই আমাকে দীর্ঘকাল অনেক সমালোচনায় সমৃদ্ধ হতে হয়েছে। (উত্তীর্ণ, 
মায়ার, ২০১২ : ৬৩)

বিষয়ের সঙ্গে ভাষার অনিয়মের উপমোচ্যতা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করছেন তিনি। কবির 
সমালোচনায় তাঁর ভাষা কবিতার মতোই গীতিকে ও তাতে এক ছাড়না, অন্তর্ভুক্ত 
থাকে। শচ্ছন্দ কবিতে তিনি প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের কবিতায় কবির 
আত্মপ্রকাশের তুলনামূলক বিচার করেছিলেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা কব্য কবি 
নিজের পরিচয় গুরুত্বে দাখিল করে নিতেন। কিন্তু কব্যবিষয়ের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল
প্রত্যক্ষত অতিবাহিত। কাল্পনিক ব্যক্তিকে দৃষ্টি তথা প্রাতিষ্ঠাকাতা দখল করে নিল। শিল্প পরিসর। মানন্দ সৈয়দ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন:

আধুনিককালে এসে ঐ সম্বারী সমার্থ হলো না আর, আত্মগোপনই হয়ে দাড়াল অন্যতম পিতা: বিহারীলাল কর মূলধন নিজেদের উপস্থিত করেছেন তাদের কবিতাবলম্ব। সরাজীবন অজ্ঞেয়। সমাজ-প্রসঙ্গে লগ্ন ও পরিকীর্ণ থেকে অন্তর্জীবন বৰ্ত্তিকান্তকে একক আনন্দচক্ষু হয়ে সশস্ত্র করে গেছেন। আর নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী — যা দিয়ে তার সাহিত্যভূমিক প্রবেশ, যে সমাজ-বিদ্রোহের যায় নিবেদন অন্তমাত্রই এক প্রাণপ্রাপ্ত বাণীর একতা। এমন কি অনুষ্ঠান জায়নিন্দ দাশ প্রশস্তুতী মূল্য মর্মের বলে উঠিয়েছিলেন: 'কেউ যায়া জানে নাই — কোনো এক বাণী/আমি যাচ আনি' এবং তারপরই 'আমার মতন আর নাই কেউ।'

...প্রাতিষ্ঠাকাতা বিজনাতাকে বিদ্রোহী। সাহিত্যিক প্রবাহ তিনি তার এক-একটি দেশের মতো — সামাজিক তরাসবল তার দীর্ঘক্ষণের ক্রমাগত আছাড়ের পাড়া। কর্মনা যেন দেশে যখন চিকিৎসালয় মূলধন নিজেই শিক্ষামূলক, তখন পরিশেষে যখন যুদ্ধের সময় যাস যেকারী নয়। আমারা প্রতাহিকতার সুর-মোটা নানা সৃষ্টি নে যা, তার বাইরে তথ্য খুব প্রতিক্ষে একা আসার; যুদ্ধশত্রু এক। শিল্পবিদ্যা এই দর্শনে বিষয় আনন্দচক্ষুকে ক্রমাগত শাক্তি বর্ণে অবদান করে ফেলতে চায়। (মানন্দ, ২০১১ : ১২০-১২১)

সমালোচকের গদ্যকে সৃষ্টিশীল করে মানন্দ সৈয়দ এসেছে। রচনাটি সাহিত্য-রস আনন্দের উপায়গী আনন্দ পরিবেশ রচনা করে দিতে চেয়েছেন। তবে তারমান সামাজিক ধরন সকলকারণের ‘ইম্প্রেশনিস্টিক’ অথবা পুরোপুরি কবিতাবৃত্তি যায়। সাহিত্যরসের সৃষ্টি বিশ্বলিঙ্গ বা রূপবাদী সমালোচনা-চিত্রিতে তিনি বেশি ব্যবহার; যেখানে রয়েছে পুষ্পামুলুক বাণী-বিশ্বলিঙ্গ, বিচার ও মূল্যনির্ধারণ। এদিক থেকে তার ভাষা কিংবা সমালোচনা ভঙ্গি অনেকটা বুদ্ধিদেহীয় সমালোচনার সমগ্রীয়।

সমালোচনার তাত্ত্বিক রূপের পরিবেশ, পরিমার্জন বিভিন্ন সময়ে হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। মানন্দ সৈয়দের সমালোচনা-ভঙ্গি ও তার সমালোচক-সমর্থ যুগপথযোগ্যতা তথা মান নির্ধারণ প্রসঙ্গে একটা সাম্প্রদায় নীতিযুক্ত যে, তার সময়কালের বিচিত্রবিহারী সমালোচনার মধ্য দিয়ে তিনি একজন শক্তিশালী সংগঠকের তুর্জিতকাকে নিয়েছিলেন। শিল্প-সাহিত্য-সমালোচনার সংগঠন, নানা তত্ত্ববৃত্তি, সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা প্রত্যাশি ব্যাখ্যাকে করে; সমালোচনায় উদার ও অহিংস স্বভাবের উদাহরণ সৃষ্টি করে সর্বপরিশে শিল্পে প্রতি এককনিষ্ঠ নান্দিনি অনুভব নিশ্চিত প্রকাশের মধ্য দিয়ে অবদূর্ব মানন্দ সৈয়দ অনন্য ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন। বাংলা বা বাংলাদেশকেন্দ্রীয় সমালোচনায় তার সমালোচনার গৌরব তাই অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।
টীকা

১ অলংকারশাস্ত্রে ভারতীয় আলঙ্কারিকতায় সৌন্দর্যের স্বরূপ, মাপকাঠি ইত্যাদির কথা বলেছেন। এছাড়াও এছাড়া শব্দ, বাক্য, ব্যাখ্যা, ঐচ্ছিক, রস, কবীর দোষ-গুণ, শ্রেণিবিভাজন ইত্যাদি। রসবাদী, ধর্মনবাদী বা অলংকারবাদী আলঙ্কারিকের কাব্যের মূখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে আনন্দ দানের কথাই বলেছেন। সেই ক্ষেত্রে তাঁরা রস, ব্যাখ্যা, রীতি, ঐচ্ছিক বা অলংকারকে বিষয় ধরেছেন। অতিন্তো গুণকাব্যের আবাদকে বোঝাতে চেয়েছেন যেন আনন্দরূপ চতুর্থিতা হিসেবে। ভারতীয় মতে, বাচ্যবর্গের আশয় ছাড়া কখনও আনন্দ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ভাব-মূল্য-অলংকার-রীতির সামর্থ্যে বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে। কিন্তু ব্যাপারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাচ্যকে ছড়িয়ে বাচ্যতীত ব্যাখ্যা সৃষ্টি করে বিষয়ের অনুরূপ। বাচ্যতীতিত এই অনুরূপ বা ব্যাখ্যাতা হল কব্যের আশয়। (প্রভূত্বা, অনুলতচন্দ্র, ১৯৬৩ : ২-২০)

গ্রন্থপঞ্জি

অনুলতচন্দ্র গুণ (১৯৬৩)। কাব্যজ্ঞানস, বিখ্যাতভারতী, কলকাতা

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (২০০২)। বাংলা সমালোচনার ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

অনু হোসেন (সম্পা. ২০১৫)। আবদুল মাল্লান সৈয়দ রচনাবলি (ভূতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমি, ঢাকা

আবদুল মাল্লান সৈয়দ (১৯৯৪)। বিবেচনা-প্রকাশনা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

আবদুল মাল্লান সৈয়দ (২০০৯)। দুই কবি, সৃষ্টি পত্র, ঢাকা

আবদুল মাল্লান সৈয়দ (২০১১)। দুইতম কবি, ভূতীয় সংস্করণ, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা

আহমদ মাশহর (২০১২)। আবদুল মাল্লান সৈয়দ : সর্বসম্ম নিয়ে সাহিত্যিক, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় (২০০৬)। সাহিত্য বিচার: তত্ত্ব ও প্রয়াগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

তীর্থের চাঁদুরী (২০০৩)। 'বাংলাদেশের পঞ্চিশ বছরের সাহিত্যগতব্যাখ্যা', বাংলাদেশের পঞ্চিশ বছরের সাহিত্য (সম্পা. সাঙ্গে-উর রহমান), বাংলা একাডেমি, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৪)। রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বাদশ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ, ঐতিহ্য, ঢাকা